স্মৃতিসৌরভ

অসীম মজুমদার

মানুষের জীবন যেন একটা ঘূর্ণি। তার জীবনে ঘটে যাওয়া যোগাযোগ বা ঘটনাগুলির ওপর তার না থাকে কোনও নিয়ন্ত্রণ, না সে পায় তার কোনও পূর্বাভাস। আজ পরিণত বয়সে ভাবি কী করে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল একজন অশীতিপর আর একজন প্রায় অর্ধেক বয়সী মানুষের নিবিড় সম্পর্ক!

স্থান ওড়িশার রৌরকেলা, চাকরিসূত্রে আমার সেখানে যাওয়া। একদিন সন্ধ্যার দিকে কোয়ার্টার-এর কাছাকাছি একটা পানের দোকানে কিছু কিনতে দাঁড়িয়ে আছি। সেইসময় দুজন ভদ্রলোক সেই দোকানে এলেন। একজন আমার পূর্বপরিচিত কুণ্ডুদা, তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন অপর ভদ্রলোকের সঙ্গে। নাম তাঁর মনোরঞ্জন আচার্য। এরপর যখনই আচার্যবাবুর সঙ্গে দেখা হত, তিনি ঠাকুরের প্রসঙ্গ করতেন আর আমি মন দিয়ে শুনতাম। একদিন আচার্যবাবু আমায় বললেন, ''এখানে শ্রীশ্রীমায়ের এক মন্ত্রশিষ্য আছেন, কাছাকাছি থাকেন। যাবেন কি?'' বললাম, ''নিশ্চয়ই যাব।'' ভাবলাম, শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য তো সাধারণ মানুষ হতে পারেন না! সে-অনুমান ভুল হয়নি। দুজনে এক সকালে গিয়েছিলাম। সেটা ১৯৭৩ সাল, ঠাকুরের তিথিপুজোর কয়েকদিন আগে।

মনোরঞ্জনবাবু প্রণাম করলেন, দেখাদেখি আমিও। একটা সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন ছাত্র জেনে সোজা হয়ে বসে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সেই চাহনির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা দীর্ঘ এগারো বছর আমায় বেঁধে রেখেছিল, কারণ সেদিনের পর থেকেই আমার আড্ডা, তাস খেলার ইতি। সাধারণ দু-একটা প্রশ্ন করলেন—কী করি, কোথায় থাকি এইসব। বললেন, ''সময় পেলে মাঝে মাঝে এসো।'' সেই ''মাঝে মাঝে'' কিন্তু ছেদহীন এগারো বছর পর শেষ হল, তাঁর আমাদেরকে চিরকালের মতো ছেড়ে যাবার পর।

তিনি রৌরকেলা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম অধ্যক্ষ শচীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। আমরা 'মেসোমশাই' বলে ডাকতাম। সাধক মানুষ, দেহমনপ্রাণ শ্রীশ্রীমায়ের চরণে সমর্পিত। নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন, তবে মেলামেশা করতে করতে অনেক অন্তরঙ্গ স্মৃতিরই অংশীদার করে নিয়েছিলেন আমায়। সেসব কথাই নিবোধত-র পাঠককুলকে শোনাতে চাই।

একদিন মেসোমশাই আমায় বললেন, ''এখানে ঠাকুরের নামে একটা সঙ্ঘ আছে, সেখানে প্রতি রবিবার প্রার্থনা, কথামৃত, মায়ের কথা পাঠ হয়। আমি মাঝে মাঝে যাই, তুমি পারলে এসো।'' এরপর থেকে মাঝে মাঝে আমিও যেতাম।

একদিন সকালবেলা মেসোমশাইয়ের কাছে গিয়ে গীতা পড়বার আবদার করি। তাতে আনন্দের সঙ্গে বললেন, ''ঠিক আছে, কাল থেকে একটা গীতা নিয়ে এসো, আমরা দুজনে পড়ব।'' তারপর বহুদিন ওঁর কাছে গীতা, উপনিষদ, স্বামীজীর রচনাবলি—কত কী পড়েছি কিন্তু কোনওদিন ওঁর মুখ থেকে শুনিনি

'পড়াব।' সবসময় বলতেন, ''আমরা একসঙ্গে পড়ব। ভালোই হবে, আমারও পড়া হবে।" নিজেকে তিনি আমার স্তরে নামিয়ে আনতেন। ওঁর গভীরতার তুলনা হয় না। কখনও কখনও height-এর touch দিতেন কৌতুকের ছলে।

যাই হোক, আমার গীতাপাঠ শুরু হল, শেষ করতে ছমাস বা তারও বেশি সময় লেগেছিল। এই গীতাপাঠের মাঝে মাঝে মেসোমশাই নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা বলতেন। সাংখ্যযোগ পড়াতে পড়াতে একদিন বললেন যে উনি গীতা পড়েছেন পূজনীয় সুধীর মহারাজের (স্বামী শুদ্ধানন্দ) কাছে। শুনলাম, সুধীর মহারাজ যখন শ্লোকের ব্যাখ্যা করতেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা অভিব্যক্তি তাঁর মুখে ফুটে উঠত, যা দেখে মনে হত, 'a living manifestation'। প্রতিটি শ্লোক মনে গেঁথে যেত।

সন্ন্যাসযোগ পড়াবার সময় মেসোমশাই বলেছিলেন, ''জান, আমি বি এ পাশ করার পর বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম সাধু হব বলে। বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করতে তিনি আমার সব খোঁজখবর নিলেন এবং মঠে আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন। সাধু হতে চাই শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'মূর্খের জন্য মঠ নয়।' শুনে প্রথমটা চমকে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'কী? আমি মূর্খ? আমি তো বি এ পাশ করেছি, আপনারা তো এনট্রান্সও পাশ করেননি।' বাবুরাম মহারাজ তখন কুটনো কুটছিলেন আর 'হরি ওঁ' বলছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুক সিঁদুরের মতো লাল হয়ে যাচ্ছিল। আমার কথায় কোনও উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখলাম এক সন্ন্যাসী আসছেন—মাথায় সিল্কের পাগড়ি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি। ভাবলাম—এ আবার কীরকম সাধু, সবই সিল্ক! আর একজন খালি গায়ে কুটনো কুটছেন! উনি এসে দাঁড়াতেই বাবুরাম মহারাজ বললেন, 'এক্ষুনি প্রণাম করে ধন্য হ।' তিনিই রাজা মহারাজ।

''সাধু হবার আশা ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ-তে ভর্তি হলাম। কাছেই একটা মেসে থাকতাম। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ বি এ পাশের আগে না পরে হয়েছে ঠিক মনে নেই।"

শ্রীশ্রীমা স্বপ্নে মেসোমশাইকে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর কাছে যেতে। দীক্ষাদানের পর মা ইষ্টদর্শন করিয়ে দিয়ে তাঁকে বলেছিলেন, ''এই তোমার ইষ্ট, তাঁকে চিনে নাও। এই জীবনে যদি মুক্তি পেতে চাও তবে সাধনভজন করো, আর তা না হলে শেষসময়ে আমি এসে নিয়ে যাব। আমার শরীর তো এখন ভালো যাচ্ছে না, তাই তুমি তারকের কাছে (স্বামী শিবানন্দ) সময় পেলে যেয়ো।" সেই থেকে প্রায় প্রতি রবিবার মেসোমশাই মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যেতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে মেসোমশাই বেশি কিছু বলতে পারতেন না। আবেগে গলা বসে যেত, চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠত। বুঝতে পারতাম ওঁর সম্পূর্ণ সত্তা মা-ময় হয়ে গিয়েছিল। জীবনে অনেক বিপদ, অনেক দুর্দিন এসেছে কিন্তু কখনও ভেঙে পড়েননি। মায়ের ওপর সব ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর মা-ও সব সামলে দিয়েছেন, কোনও দুঃসময়ই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এম এ পাশ করার পর বিশ্বভারতীতে যোগ দেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুব কাছে থেকে কাজ করার সুযোগ পান। ইতিহাসের গবেষণার কাজও চলতে থাকে। বিষয় ছিল, 'Ram Never Crossed the Vindhyas,' গাইড ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসর ভাণ্ডারকর। গবেষণা খুবই ভালো এগোচ্ছিল, তাতে ভাণ্ডারকরও খুব উৎসাহিত। সেইসময় শ্রীশ্রীমায়ের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী মেসোমশাইয়ের হাতে আসে। বইটিতে এক জায়গায় আছে, শ্রীশ্রীমা রামেশ্বর শিবলিঙ্গ দেখে বলছেন, ''যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছে।" ব্যস, গবেষণায় ইতি। সম্পূর্ণ থিসিসটা ছিঁড়ে ফেললেন মেসোমশাই। ভাণ্ডারকর জানতে পেরে বললেন, ''এ তুমি কী করলে? নিজের এতবড়ো ক্ষতি কেউ করে?" উত্তরে মেসোমশাই বলেছিলেন, ''শ্রীশ্রীমা যখন ওকথা বলেছেন তখন আমার গবেষণা ভুল। মিথ্যের ওপর গবেষণা করে আমি ডক্টরেট পেতে চাই না।" তখনকার দিনে ডক্টরেটের মূল্য ছিল অপরিসীম। ভাবি, কত সহজে উনি অতবড়ো সম্মান ত্যাগ করলেন!

ধীরে ধীরে বুঝেছিলাম, মেসোমশাই অন্তরে

শ্রীশ্রীমার সম্মতি না পেলে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন না। তিনি যে-স্তরের মানুষ ছিলেন তা সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেটা ১৯৭৬ বা ১৯৭৭ সাল। একদিন সকালে ওঁর সেক্টর ফাইভ-এর বাড়িতে গেছি অফিস থেকে। বাইরের ঘরে বসে ছিলেন। গম্ভীর মুখ, শুধু বললেন, ''বোসো।'' হাতে একখানা চিঠি। অনেকক্ষণ শ্রীশ্রীমায়ের ছবির দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরে আমায় বললেন, ''আমার হয়ে একটা চিঠি লিখে দাও, আমি বলছি।'' হাতের চিঠিটা ছিল ওঁর বড়ো মেয়ের, লন্ডন থেকে লেখা। বড়ো জামাই ইন্দ্রকুমারের ওপেন হার্ট সার্জারি হবে। বুঝলাম, মেয়ে যাঁকে মনের সমস্ত উদ্বেগ জানিয়েছেন, সেই বাবার প্রতি কত আস্থা! মেসোমশাইয়ের চিঠির একটা লাইন মনে আছে : ''তোমার কোনও চিন্তা নেই। ডাক্তাররা যা করার করুন, আমার যা করার আমি এখান থেকেই করব। ইন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠবে।'' কথাটা উচ্চারণের সময় যে-দৃঢ়তা আমার কানে এসেছিল তা কী করে ভাষায় প্রকাশ করি! উদ্বেগ আমারও ছিল কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল কৌতূহল। সেইসময় ওপেন হার্ট সার্জারি খুব সহজ ছিল না, যা আজ হয়েছে। অপারেশনের দিন সকালে দেখি উনি ঘরে আসনে বসে আছেন, চোখ বন্ধ। বিরক্ত না করে ফিরে গেলাম। এক সপ্তাহ পরে খবর এল ইন্দ্রকুমার সুস্থ হয়ে উঠছেন।

মেসোমশাইয়ের সবসময় একটা চিন্তা থাকত, সেটা হল শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, রৌরকেলার জন্য একটা স্থায়ী আস্তানা করা। ছোটো মন্দির হবে, একটি নাটমন্দির হবে যেখানে পাঠ ইত্যাদি হতে পারে। প্রায়ই তিনি SAIL কর্তৃপক্ষকে দরখাস্ত করে এক টুকরো জমি বা একটা বড়ো বাড়ি পাওয়ার চেষ্টা করতে বলতেন। চেষ্টা চলতে লাগল। একদিন জিজ্ঞাসা করলেন জমি বা বাড়ির কোনও খবর আছে কি না। উত্তর দিলাম, ''কোনওটারই আশা দেখছি না, ঘোরাঘুরি করাই হচ্ছে শুধু।'' তখন উনি সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক সান্যাল মেসোমশাইকে বললেন, "An organisation must have a name and habitation। নামটা হয়েছে কিন্তু স্থায়ী জায়গা এখনও হয়নি। এভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সপ্তাহে একদিন সমবেত হয়ে আরতি, পাঠ করে বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যায় না। SAIL যখন জমি বা বাড়ি কিছুই দিল না তখন আমাদেরই প্রাইভেট জমি কিনতে হবে কাছাকাছি।" আমাদের কয়েকজনকে বললেন কাছাকাছি জমি খোঁজা শুরু করতে আর সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মতামত নিতে। এই কাজে কাউকে সঙ্গে পাওয়া খুবই মুশকিল হয়ে পড়ল। শেষমেশ আমি আর প্রশান্তদা (মেসোমশাইয়ের বড়ো ছেলে) দুজনে অফিস থেকে ফিরে সদস্যদের বাড়ি যাওয়া আরম্ভ করলাম। সঙ্গে কখনও কখনও নিরঞ্জনদা থাকতেন। কিন্তু আমাদের পড়াশোনা একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি।

একদিন অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ করছিলেন মেসোমশাই। তখন উনি বিশ্বভারতীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায়ই কথাবার্তা হত কাজের বিষয়ে। গৌরীমার আশ্রমে যেতেন ভাগবত শুনতে। সেখানে আরও যেতেন ড. রাধাকৃষ্ণন, ব্রজেন শীল, অভয়চরণ গুহ প্রমুখ দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা। সবাই মাটিতে বসে গৌরীমার কথা শুনতেন।

মেসোমশাই বলে চললেন : ''কর্মক্ষেত্রে কোনও একটা অনিয়ম চোখে পড়ায় তার প্রতিবাদ করি এবং ব্যাপারটা অনেকদূর এগিয়ে যাওয়াতে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যাই। উনি সব শুনে বললেন, 'Leave Calcutta'। আমি বললাম, 'মহারাজ, আমার ওপর পুরো সংসারের দায়িত্ব, আর তাছাড়া এত ভালো চাকরি ছেড়ে কোথায় যাব, কী করব, সংসারই বা কী করে চালাব?' মহারাজ বললেন, 'ও নিয়ে তোমায় কোনও চিন্তা করতে হবে না, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি স্বয়ং মহামায়া তোমার সংসারের ভার নিয়েছেন।' মনে মনে ভাবলাম—বটে? তবে মহামায়ার খেলা দেখি!

''কলকাতা ছেড়ে হাওড়ার কুলগাছিয়াতে দিদির বাড়িতে সংসার নিয়ে উঠলাম। চুপচাপ বসে রইলাম মহামায়ার খেলা দেখব বলে। দুদিনও গেল না, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক দেখা করে অনুরোধ করলেন কুলগাছিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিতে, রাজি হয়ে গেলাম। আবার

গতানুগতিক জীবন চলতে লাগল। কিন্তু তখনও জানতাম না মহামায়ার খেলা আরও কত দেখতে হবে। এত গতিপরিবর্তন কারও জীবনে এসেছে কি না জানি না। তখন জানি 'মা' যা করেন, ভালোই। আমি বার্মায় গিয়ে কাঠের ব্যবসাও করেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে ফিরে ওড়িশায় বহরমপুরে এসে বসবাস আরম্ভ করি। নিজেকে ঝড়ের এঁটো পাতা করেছিলাম।"

আমি একদিন বললাম, ''মেসোমশাই, স্বামীজী ছাড়া আপনি তো ঠাকুরের সব পার্ষদকেই দেখেছেন। তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলুন। আপনি একদিন বলেছিলেন, ওঁরা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, অন্তর্যামী। কী করে বুঝলেন?"

''তবে শোনো। একদিন বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে গেছি। একতলায় পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘরে বসে আছি এমন সময় গোলাপ মা ওপর থেকে প্রসাদ নিয়ে এলেন, শরৎ মহারাজ আমায় বললেন, 'শচীন, যাও হাত ধুয়ে এসো। এসে প্রসাদ পাও।' আমি ভাবছি, সবই তো ব্রহ্ম, হাত ধোয়ার প্রয়োজন কী? ভাবামাত্র মহারাজ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'বেম্মজ্ঞান রাখো, হাত ধুয়ে এসে প্রসাদ পাও।' গলার স্বরে এমন একটা গাম্ভীর্য ছিল যে অমান্য করা সাধ্যের বাইরে ছিল। এমন যে কতবার হয়েছে! যতবারই ওঁদের অন্তর্যামিত্ব পরীক্ষা করতে গেছি, পরাজয়ের গ্লানি আমারই কপালে জুটেছে।

''এক রবিবার মঠে গেছি। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে বসতেই বললেন, 'তোমার মুখটা এমন মলিন কেন?' বললাম, 'আমি তো কালো, মুখও কালো।' মহারাজ বললেন, 'আমি সে-মলিনতার কথা বলছি না, কী পড়ছ আজকাল?' বললাম, 'গীতগোবিন্দ।' শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। কী বলব, এসব বলে বোঝানো অসম্ভব। তখন মনে হয়েছিল পুরো পরিবেশ তটস্থ, শঙ্কিত। বললেন, 'ও-বই পড়ার অধিকার তোমার নেই। আজই গঙ্গায় বিসর্জন দেবে। দেহবোধ সম্পূর্ণ লোপ না পেলে ওসব বই পড়ার অধিকারী হওয়া যায় না।' এরকম বহু ঘটনা আছে যা তাঁদের অন্তর্যামিত্ব বুঝিয়ে দেয়।

''রাজা মহারাজের সঙ্গ করার সৌভাগ্য বেশি হয়নি। শুধু কতগুলো ঘটনা চোখের সামনে এখনও জ্বলজ্বল করে। বাবুরাম মহারাজ মাঝে মাঝে যে-ঘরটায় আমাদের ধ্যান করাতেন তার পাশের ঘরটাই ছিল রাজা মহারাজের। একদিন আমরা ধ্যানের ক্লাসে বসে আছি, এমন সময় রাজা মহারাজ তাঁর ঘরে তাঁরই কৃপাপ্রাপ্ত এক ব্রহ্মচারীকে ডেকে পাঠালেন। সম্ভবত দুজন ব্রহ্মচারীর মধ্যে ইষ্টকে নিয়ে রঙ্গ করতে গিয়ে তা কলহে পরিণত হয়। রাজা মহারাজের ঘরের দরজা হালকা করে ভেজানো ছিল। শুনতে পেলাম মহারাজ বলছেন, 'ঠাকুরের কাছে এসে ভালোবাসায় যদি পরস্পরকে আ--লি--ঙ্গ--ন'—পুরোটা উচ্চারণ করতে পারলেন না। বাবুরাম মহারাজ দরজায় উঁকি মেরেই আমাদের বললেন, 'ওরে তোরা শিগ্‌গির আয়, পায়ে পড়ে ধন্য হয়ে যা। এ-জিনিস আর এ-জীবনে দেখতে পাবি না।' গিয়ে দেখি রাজা মহারাজের শরীর যেন বিশাল আকার ধারণ করেছে, চোখ বিশাল ও আয়ত, সারা শরীর জ্যোতির্ময়! আর বাবুরাম মহারাজ 'জয় মা জয় মা, জয় ঠাকুর জয় ঠাকুর' বলে চলেছেন। এখনও চোখের সামনে ঘটনাটা ভাসে। আর একবার রাজা মহারাজকে দেখেছিলাম ঢাকায়, ঠাকুরকে আরতি করছিলেন। আরতির তালে তালে পেশী থেকে জ্যোতি ঠিকরে পড়ছিল।"

ভাষা যেখানে পৌঁছতে পারে না তাকে ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা অপচেষ্টা, তা অনুভবের বিষয়। অনেকদিন মেসোমশাইয়ের কাছে থাকতে থাকতে সেই অনুভূতির কিছুটা পেয়েছিলাম। এসব উনি দিতে পারতেন কিন্তু এ-বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, হয়তো বা একটু কৃপণও ছিলেন। চট করে কিছু পাওয়া যেত না। বাজিয়ে নিতেন।

লিখতে বসে এত কথা, এত ঘটনা মনে পড়ছে যা লিখে শেষ করা অসম্ভব। তাছাড়া ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে নেওয়াও আমার অসাধ্য। আমার কলম দিয়ে ঠাকুর যতটুকু লিখিয়ে নেবেন ততটুকুই লিখতে পারব।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর আশ্রমের জন্য একখণ্ড জমি পাওয়া গেল টাউনশিপের কাছাকাছি। হামিরপুর গ্রামের প্রধান বৃন্দাবন বেহেরা রাজি হয়েছেন ঊনত্রিশ ডেসিমেল জমি বিক্রি করতে। মেসোমশাইকে বলতেই

আনন্দে ওঁর বয়স যেন কয়েকবছর কমে গেল। চোখেমুখে শিশুর আনন্দ। বললেন, ''এবারে ঠাকুরের মায়ের নাম করে কাজে নেমে পড়ো।''

আমরা কাজে নেমে পড়লাম। নেমেই দেখি অথই জল। আদিবাসীর জমি কিনতে গেলে যে কত শত বাধা পেরিয়ে আসতে হয় তা জানতাম না। সরকারের অনুমতি ছাড়া এক ইঞ্চি জমি কেনা সম্ভব নয়, আর অনুমতি পেতে শবরীর ধৈর্য প্রয়োজন। এই ব্যাপারে প্রশান্তদা আমার সবসময়ের সঙ্গী ছিলেন। অনেক মতান্তর, অনেক সমস্যা হলেও মেসোমশাইয়ের ব্যক্তিত্বের কাছে সব খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল। ১৯৭৮-এ জমি রেজিস্ট্রি হল। তারপর মেসোমশাই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পরমপূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীকে চিঠি লিখে প্রার্থনা জানালেন রৌরকেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জমিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। সেই সম্মতি পাওয়া গেল। সম্মতিজ্ঞাপক চিঠিটা আসামাত্র একটা অদ্ভুত আবেগে সবাই যেন ভেসে গিয়েছিলাম। তখন সকলেরই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান—মন্দির তৈরি করতে হবে। সকলেই যেন একমন, একপ্রাণ! সকলের একই উদ্দেশ্য!

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন স্থির হল ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮। একে ঘিরে যে-প্রস্তুতি, যে-পরিশ্রম হয়েছে, সেটা অন্য ইতিহাস। আমি শুধু মেসোমশাইকেই লক্ষ করতাম। কোনও দুশ্চিন্তা, উদ্বেগের ছাপ থাকত না তাঁর মুখে। যেন জানতেন, এটা হবেই। পরমপূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি পূজনীয় স্বামী আত্মানন্দজীকে রৌরকেলার সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন সন্ধ্যায় মেসোমশাই আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি তো মহারাজের সঙ্গে গর্তের ভিতর ছিলে, কিছু বুঝতে পেরেছ বা অনুভব করেছ?'' বললাম, ''তেমন কিছু নয়, শুধু কর্ণিকাটা যখন উনি হাতে ধরিয়ে দিতে বললেন তখন মনে হল মহারাজের সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।'' মেসোমশাই বললেন, ''আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা মন দিয়ে লক্ষ করেছি। তোমাদের গুরুদেব সম্পূর্ণ রামকৃষ্ণময় হয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। তোমরা কিছু কর বা না কর, মন্দির মাটি ফুঁড়ে বেরোবে। তোমরা যদি কাজ করতে পার, নিজেদের ধন্য মনে কোরো।''

সত্যিই তাই। মন্দির মাটি ফুঁড়েই বেরিয়েছে। কোথা থেকে যে কতরকম যোগাযোগ হতে লাগল তার কারণ খুঁজতে গিয়ে ক্লান্তি ছাড়া কিছুই পাইনি। কারণ তো জানাই আছে—মায়ের কাছে একজনের ঐকান্তিক প্রার্থনা, যাঁকে আমি চিনি, জানি, শ্রদ্ধা করি।

ভিত্তিপ্রস্তরস্থাপনের পরই মেসোমশাই সঙ্ঘের প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করলেন। সান্যাল মেসোমশাইয়ের অনেক অনুরোধেও কোনও কাজ হল না। বললেন, ''সান্যালমশাই, আমার শরীর বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়েছে আর আমি দেখতে পাচ্ছি ঠাকুর ড. ঘোষের কাঁধে ভর করেছেন। এখন থেকে সঙ্ঘকে উনিই ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারবেন।''

মন্দির যেন একটু একটু করে মাটি ফুঁড়েই বেরোতে লাগল। তা না হলে মাত্র নয় মাসে ওই বিশাল মন্দির তৈরি হল কী করে? এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের পড়াশোনা কিন্তু বন্ধ হয়নি। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট দিতাম। প্রায়ই দেখতাম আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে মেসোমশাই হঠাৎ চুপ করে যেতেন বেশ কিছুক্ষণ। বুঝতে পারতাম কোনও বিষয়ে গভীর চিন্তা করছেন। কিছু জিজ্ঞাসা করতাম না, জানতাম যদি কিছু বলবার থাকে নিজেই বলবেন। মন্দিরের কাজ যত এগোচ্ছিল ততই দেখতাম মেসোমশাই মায়ের চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন। একদিন বললেন, ''একবার খুব মন খারাপ তাই ভাবলাম মায়ের কাছে যাই উদ্বোধনে। তখন মায়ের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। ঢুকতেই দেখলাম শরৎ মহারাজ বসে আছেন। বললেন, 'ওপরে যাওয়া চলবে না, মায়ের শরীর খারাপ।' মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, চোখে জল এসে গেল। কাঁদো কাঁদো স্বরে বললাম, 'মা কি শুধু আপনার?' হঠাৎ শুনতে পেলাম মা ওপরের বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে বলছেন, 'এই তো বাবা আমি, কী হয়েছে তোমার?' বললাম, 'আমার মন খুব খারাপ, কিছু ভালো লাগছে না।' মা বললেন,

'তোমার আবার কীসের চিন্তা বাবা? ঠাকুর আছেন, কিছু ভেবো না।'

''মায়ের স্বরূপ দেখার সৌভাগ্য হবে কখনও ভাবিনি। করুণাময়ীর কৃপা ছাড়া এ সম্ভব নয়। একদিন আমি আর পদ্মবিনোদ বাগবাজারে গঙ্গার ঘাটে ভোরবেলা বেড়াচ্ছি আর মা সেইসময় গঙ্গায় ডুব দিয়েছেন। পদ্মবিনোদ শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকে শ্লোক আবৃত্তি শুরু করলেন, তারপর এ কী? দেখি মা দুহাত তুলে জলের ভেতর থেকে আশীর্বাদ করছেন। এটা আসল কথা নয়, মা তো সব সন্তানকেই আশীর্বাদ করেন। কিন্তু কী দেখলাম জান? দেখলাম, মায়ের দুহাত জগদ্ধাত্রীর হাত, চাঁপা ফুলের মতো রং, হাতের চেটোর রং পদ্মফুলের মতো। মুহূর্তমাত্র।

''মা ঠাকরুনকে আর একবার দেখেছি। তিনি তখন শরীরে নেই। কোনও উৎসব ছিল বোধহয়, সকাল সকাল গেছি। গলির মোড়ে মুখ ফেরাতেই দেখি স্বয়ং মা সশরীরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমি তো হতভম্ব! আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী চাও?' কিছুই বলা হল না। সংবিৎ ফিরতে দেখি কেউ কোথাও নেই।''

এদিকে আশ্রমের মন্দির তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। পরমপূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজকে আবার অনুরোধ করা হল—দ্বারোদ্‌ঘাটনের শুভকাজ তাঁর হাত দিয়েই হোক। সম্মতি এসে গেল। মেসোমশাই যেন এটা জানতেনই। তিনি আর 'মন্দির' বলতেন না, প্রায়ই শুনতাম 'মঠ' বলছেন।

৬ মার্চ, ১৯৮০ মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন ধার্য হল। সেদিন মনে হচ্ছিল আমরা বেলুড় মঠে আছি। মেসোমশাইকে এতদিন ধরে দেখে বুঝেছিলাম, ঐকান্তিক প্রার্থনায় কী না হয়! বইতে পড়েছি, চোখে দেখলাম, প্রত্যক্ষ অনুভব করলাম।

এবার সাবধান করার পালা। মেসোমশাই বলতেন, ''নিজেদের ঠাকুরের কৃপার যোগ্য করে তোলো। সুন্দর সুচারুভাবে মন্দিরের পরিচালনা যেন হয়। যে-ই আসুক যেন আনন্দ নিয়ে ফেরে।'' একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, ''যখনই এখানকার মঠে যাই, গর্ভমন্দিরের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এতবড়ো মন্দিরে এত প্রশস্ত গর্ভমন্দির, ঠাকুরের ছবি ঠিক যেন মানানসই লাগছে না। মূর্তি বসলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।''

১৯৮৩ একটা স্মরণীয় বছর। বেলুড় মঠ থেকেই সংবাদ এল, এক গুজরাটি ভদ্রলোক, নাম সি ডি আমিন, পরমপূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজকে জানিয়েছেন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি দিতে চান, যেমনটি বেলুড় মঠে আছে। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে বলেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ড. অসিত ঘোষ মি. আমিনের চিঠি পাওয়ামাত্র মেসোমশাইকে জানান। আমি সেদিন গিয়ে, সব পাওয়ার আনন্দে যেমন ছোটো শিশুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মেসোমশাইকে তেমনই দেখলাম। আমায় দেখে বললেন, ''এই যে এসেছ? বোসো। আজ একটা খুব ভালো খবর দিলেন তোমাদের ড. ঘোষ। মন্দিরে এবার ঠাকুরের মূর্তি বসবে।'' মনে মনে ভাবলাম—যেদিন আপনি বলেছিলেন যে মূর্তি ছাড়া গর্ভমন্দির মানায় না, সেদিনই বুঝেছিলাম খুব শীঘ্রই মূর্তি বসবে।

৬ এপ্রিল ১৯৮৪ স্বর্গীয় পরিবেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা হল। এক সপ্তাহ পরে আমায় বললেন, ''একটা কথা মনে রেখো, বিগ্রহ যেন গলগ্রহ না হয়।''

বোধহয় মে, ১৯৮৪। মেসোমশাই জামসেদপুরে ওঁর ডাক্তার ছেলের কাছে চলে যাবেন স্থির করলেন। জীবনে এত কখনও কাঁদিনি। কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল, আর বোধহয় আমাদের দেখা হবে না। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ''জামসেদপুর তো বেশিদূর নয়, মাঝে মাঝে আমার কাছে চলে আসতে তো পার?''

তিনি দেহে থাকতে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। গিয়েছিলাম ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, যখন খবর পেলাম উনি আমাদের ছেড়ে চিরকালের মতো চলে গেছেন।

আজও মেসোমশাইয়ের কথা ভাবলে চোখের জল বাধা মানে না। তাঁর অনেক স্নেহ-আশীর্বাদ পেয়েছি, সেসবই সযত্নে অন্তরে সঞ্চয় করে রেখেছি।

পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা অজয়প্রাণামাতাজীর সৌজন্যে অধুনা অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী লেখকের এই স্মৃতিকথাটি প্রাপ্ত।